হরতাল

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

দেবতাদের ভয় 2
রাখাল ছেলে 5
লেজের কাহিনী 9
ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা 14
হরতাল 17

www.bengaliebook.com

দেবতাদের ভয়

[পাত্র-পাত্রী : ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারদ, অগ্নি, বরুণ ও পবন।]

ইন্দ্র : কি ব্যাপার?

ব্রহ্মা : আমার এত কষ্টের ব্রহ্মাণ্ডটা বোধহয় ছারখার হয়ে গেল। হায়—হায়—হায়!

নারদ : মানুষের হাত থেকে স্বর্গের আর নিস্তার নেই মহারাজ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ইন্দ্র : আঃ বাজে বকবক না করে আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন না, কি হয়েছে?

ব্রহ্মা : আর কী হয়েছে। অ্যাটম বোমা!–বুঝলে? অ্যাটম বোমা।

ইন্দ্র : কই, অ্যাটম বোমার সম্বন্ধে কাগজে তো কিছু লেখে নি?

নারদ : ও আপনার পাঁচ বছরের পুরনো মফঃস্বল সংস্করণ কাগজ। ওতে কি ছাই কিছু আছে নাকি?

ইন্দ্র : অ্যাটম বোমাটা তবে কি জিনিস?

ব্রহ্মা : মহাশক্তিশালী অস্ত্র। পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে।

ইন্দ্র : আমার বজ্রের চেয়েও শক্তিশালী?

নারদ : আপনার বজ্রে তো শুধু একটা তালগাছ মরে, এতে পৃথিবীটাই লোপাট হয়ে যাবে।

ইন্দ্র : তইতো, বড় চিন্তার কথা। এই রকম অস্ত্র আমরা তৈরী করতে পারি না? বিশ্বকর্মা কি বলে?

নারদ : বিশ্বকর্মা বলছে তাঁর সেকেলে মালমশলা আর যন্ত্রপাতি দিয়ে ওসব করা যায় না। তা ছাড়া সে যা মাইনে পায় তাতে অতি খাটুনি পোষায়ও না।

ইন্দ্র : তবে তো মুস্কিল! ওরা আমার পুষ্পকরথের নকল করে এরোপ্লেন করেছে, আর বজ্রের নকল করে অ্যাটম বোমাও করল। এবার যদি হানা দেয় তা হলেই সেরেছে। আচ্ছা অগ্নি, তুমি পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে দিতে পার না?

অগ্নি : আগে হলে পারতুম। আজকাল দমকলের ঠেলায় দম আটকে মারা যাই যাই অবস্থা।

ইন্দ্র : বরুণ! তুমি ওদের জলে ডুবিয়ে মারতে পার না?

বরুণ : পরাধীন দেশ হলে পারি। এই তো সেদিন চট্টগ্রামকে ডুবিয়ে দিলুম। কিন্তু স্বাধীন দেশে আর মাথাটি তোলবার জো নেই। কেবল ওরা বাঁধ দিচ্ছে।

ইন্দ্র : পবন?

পবন : পরাধীন দেশের গরিবদের কুঁড়েগুলোই শুধু উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ কি?

ইন্দ্র : আমাদের তৈরী মানুষগুলোর এত আস্পর্ধা? দাও সব স্বর্গের মজুরদের পাঁচিল তোলার কাজে লাগিয়ে—

নারদ : কিন্তু তারা যে ধর্মঘট করেছে।

ইন্দ্র : ধর্মঘট কেন? কি তাদের দাবি?

নারদ : আপনি যেভাবে থাকেন তারাও সেইভাবে থাকতে চায়।

ইন্দ্র : (ঠোঁট কামড়িয়ে) বটে? মহাদেব আর বিষ্ণু কি করছেন?

ব্রহ্মা : মহাদেব গাঁজার নেশায় বুদ হয়ে পড়ে আছেন। আর বিষ্ণু অনন্ত শয়নে নাক ডাকাচ্ছেন।

ইন্দ্র : এঁদের দ্বারা কিছু হবে না। আচ্ছা, মানুষগুলোকে ডেকে বুঝিয়ে দিতে পার যে এতই যখন করছে তখন ওরা একটা আলাদা স্বর্গ বানিয়ে নিক না কেন?

নারদ : তা তো করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া নাকি ওদের কাছে স্বর্গ, খাওয়া-পরার কষ্ট নাকি কারুর সেখানে নেই। সবাই সেখানে নাকি সুখী।

ইন্দ্র : কিন্তু সেখানে কেউ তো অমর নয়।

ব্রহ্মা : নয়। কিন্তু মরা মানুষ বাঁচানোর কৌশলও সেখানে আবিষ্কার হয়েছে। অমর হতে আর বাকি কী?

ইন্দ্র : তা হলে উপায়?

ব্রহ্মা : উপায় একটা আছে। ওদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটিটা যদি বজায় রাখা যায় তা হলেই ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে মারা পড়বে, আমরাও নিশ্চিন্ত হব।

ইন্দ্র : তা হলে নারদ, তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি চলে যাও সটান পৃথিবীতে। সেখানে লোকদের বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের বিষ ঢুকিয়ে দাও। তা হলেই তা হলেই আমাদের স্বর্গ মানুষের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

নারদ : তথাস্তু। আমার ঢেঁকিও তৈরী আছে!

[নারদের প্রস্থান]

রাখাল ছেলে

সূর্য যখন লাল টুকটুকে হয়ে দেখা দেয় ভোরবেলায়, রাখাল ছেলে তখন গরু নিয়ে যায় মাঠে। সাঁঝের বেলায় যখন সূর্য ডুবে যায় বনের পিছনে, তখন তাকে দেখা যায় ফেরার পথে। একই পথে তার নিত্য যাওয়া-আসা। বনের পথ দিয়ে সে যায় নদীর ধারের সবুজ মাঠে। গরুগুলো সেখানেই চ'রে বেড়ায়। আর সে বসে থাকে গাছের ছায়ায় বাঁশিটি হাতে নিয়ে, চুপ করে চেয়ে থাকে নদীর দিকে, আপন মনে ঢেউ গুনতে গুনতে কখন যেন বাঁশিটি তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়। আর সেই সুর শুনে নদীর ঢেউ নাচতে থাকে, গাছের পাতা দুলতে থাকে। আর পাখিরা কিচির-মিচির করে তাদের আনন্দ জানায়!

একদিন দোয়েল পাখি তাকে ডেকে বলে :

।। গান।।

ও ভাই, রাখাল ছেলে!
এমন সুরের সোনা বলে কোথায় পেলে।
আমি যে রোজ সাঁঝা-সকালে,
বসে থাকি গাছের ডালে,
তোমার বাঁশির সুরেতে প্রাণ দিই ঢেলে।।
তোমার বাঁশির সুর যেন গো নির্ঝরিণী
তাই শোনে রোজ পিছন হতে বনহরিণী।
চুপি চুপি আড়াল থেকে
সে যায় গো তোমায় দেখে
অবাক হয়ে দেখে তোমায় নয়ন মেলে।।

রাখাল ছেলে অবাক হয়ে দেখে সত্যিই এক দুষ্টু হরিণী লতাগুলোর আড়াল থেকে মুখ বার করে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে তার দিকে। সে তাকে বললে :

ওগো বনের হরিণী!

তুমি রইলে কেন দূরে দূরে,
বিভোর হয়ে বাঁশির সুরে,
আমি তো কাছে এসে বসতে তোমায়
নিষেধ করি নি।

হরিণীর ভয় ভেঙে গেল, সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এল রাখাল ছেলের কাছে। সে তার পাশটিতে এসে চোখে চোখ মিলিয়ে শুনতে লাগল তার বাঁশি। অবোধ বনের পশু মুগ্ধ হল বাঁশির তানে। তারপর প্রতিদিন সে এসে বাঁশি শুনত, যতক্ষণ না তার রেশটুকু মিলিয়ে যেত বনান্তরে।

হরিণীর মা-র কিন্তু পছন্দ হল না তার মেয়ের এই বাঁশি-শোনা। তাই সে মেয়েকে বলল :

ও আমার দুষ্ট মেয়ে
রোজ সকালে নদীর ধারে যাস কেন ধেয়ে।
ভুল ক'রে আর যাসিনেরে তুই শুনতে বাঁশি
ওরা সব দুষ্ট মানুষ মন ভুলাবে মিষ্টি হাসি
বুঝি বা ফাঁদ পেতেছে ওরা তোকে একলা পেয়ে।।

তখন হরিণী তার মা-কে বুঝোয় :

না গো মা, ভয় ক'রো না।
সে তো মানুষ নয়।
সে যে গো রাখাল ছেলে
আমি তার কাছে গেলে
বড্ড খুশি হয়।

এমনি ক'রে সুরের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে হরিণী। রাখাল ছেলে হরিণীকে শোনায় বাঁশি, আর হরিণী রাখাল ছেলেকে শোনায় গান :

তোমার বাঁশির সুরা যেন গো
নদীর জলে ঢেউয়ের ধ্বনি,

পাতায় পাতায় কাঁপন জাগায়
মাতায় বনের দিনরাজনী।
সকাল হলে যখন হেথায় আস
বাঁশির সুরে সুরে আমায় গভীর ভালবাসো–
মনের পাখায় উড়ে আমি
স্বপনপুরে যাই তখনি।।

কিন্তু হরিণীর নিত্য স্বপনপুরে যাওয়া আর হল না। একদিন এক শিকারী এল সেই বনে। দূর থেকে সে অবাক হয়ে দেখল একটি রাখাল ছেলে বিহ্বল হয়ে বঁশি বাজিয়ে চলেছে আর একটি বন্য হরিণী তার পাশে দাড়িয়ে তার মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে। কিন্তু শিকারীর মন ভিজল না। সেই স্বর্গীয় দৃশ্যে, সে এই সুযোগের অপব্যয় না করে বধ করল হরিণীকে। মৃত্যুপথযাত্রী হরিণী তখন রাখাল ছেলেকে বললে–বাঁশিতে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই তুমি, বোধহয় মানুষ বলেই, আমার মৃত্যুর কারণ হলে। তবু তোমায় মিনতি করছি :

বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু
আমার মরণকালে,
মরণ আমার আসুক আজি
বাঁশির তালে তালে।
যতক্ষণ মোর রয়েছে প্রাণ
শোনাও তোমার বাঁশরির তান
বাঁশির তরে মরণ আমার
ছিল মন্দ-ভালে।
বনের হরিণ আমি যে গো
কারুর সাড়া পেলে,
নিমেষে উধাও হতাম
সকল বাধা ঠেলে।
সেই আমি বাঁশরির তানে
কিছুই শুনিনি কানে
তাই তো আমি জড়ালেম এই

কঠিন মরণ-জালে।।

বাঁশি শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে হরিণীর মৃত্যু হল। সাথীকে হারিয়ে রাখাল ছেলে অসীম দুঃখ পেল। সে তখন কেঁদে বললে :

বিদায় দাও গো বনের পাখি!
বিদায় নদীর ধার,
সাথীকে হারিয়ে আমার
বাঁচা হল ভার।
আর কখনো হেথায় আসি
বাজাব না এমন বাঁশি
আবার আমার বাঁশি শুনে
মরণ হবে কার।

বনের পাখি, নদীর ধার সবাই তাকে মিনতি করলে-তুমি যেও না।

যেও না গো রাখাল ছেলে
আমাদেরকে ছেড়ে,
তুমি গেলে বনের হাসি
মরণ নেবে কেড়ে,
হরিণীর মরণের তরে
কে কোথা আর বিলাপ করে
ক্ষণিকের এই ব্যথা তোমার
আপনি যাবে সরে।

দূর থেকে শুধু রাখাল ছেলে বলে গেল :

ডেকো না গো তোমরা আমায়
চলে যাবার বেলা,
রাখাল ছেলে খেলবে না আর
মরণ-বাঁশির খেলা।

লেজের কাহিনী

একটি মাছি একজন মানুষের কাছে উড়ে এসে বলল : তুমি সব জানোয়ারের মুরুব্বি, তুমি সব কিছুই করতে পার, কাজেই আমাকে একটি লেজ করে দাও।

মানুষটি বললে : কি দরকার তোমার লেজের?

মাছিটি বললে : আমি কি জন্যে লেজ চাইছি? যে জন্যে সব জানোয়ারের লেজ আছে–সুন্দর হবার জন্যে।

মানুষটি তখন বলল : আমি তো কোন প্রাণীকেই জানি না যার শুধু সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে। তোমার লেজ না হলেও চলবে।

এই কথা শুনে মাছিটি ভীষণ ক্ষেপে গেল আর সে লোকটিকে জব্দ করতে আরম্ভ করে দিল। প্রথমে সে বসল তার আচারের বোতলের ওপরে, তারপর নাকে সুড়সুড়ি দিল, তারপর এ-কানে ও-কানে ভন্‌ভন্‌ করতে লাগল। শেষকালে লোকটি বাধ্য হয়ে তাকে বলল : বেশ, তুমি উড়ে উড়ে বনে, নদীতে, মাঠে যাও, যদি তুমি কোনো জন্তু, পাখি কিংবা সরীসৃপ দেখতে পাও যার কেবল সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে, তার লেজটা তুমি নিতে পার। আমি তোমায় পুরো অনুমতি দিচ্ছি।

এই কথা শুনে মাছিটি আহলাদে আটখানা হয়ে জানালা দিয়ে সোজা উড়ে চলে গেল।

বাগান দিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল একটা গুটিপোকা পাতার ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। সে তখন গুটিপোকার কাছে উড়ে এসে চেচিয়ে বলল : গুটিপোকা! তুমি তোমার লেজটা আমাকে দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে।

গুটিপোকা : বটে? বটে? আমার মোটে লেজই হয় নি, এটা তো আমার পেট। আমি ওটাকে টেনে ছোট করি, এইভাবে আমি চলি। আমি হচ্ছি, যাকে বলে, বুকে-হাঁটা প্রাণী।

মাছি দেখল তার ভুল হয়েছে, তাই সে দূরে উড়ে গেল।

তারপর সে নদীর কাছে এল। নদীর মধ্যে ছিল একটা মাছ আর একটা চিংড়ি। মাছি মাছটিকে বলল। তোমার লেজটা আমায় দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে আছে।

মাছ বলল : এটা কেবল সুন্দর হবার জন্যে আছে তা নয়, এটা আমার দাঁড়। তুমি দেখ, যদি আমি ডান-দিকে বেঁকতে চাই তাহলে লেজটা আমি বাঁ-দিকে বেঁকাই আর বাঁ-দিকে চাইলে ডান-দিকে বেঁকাই। আমি কিছুতেই আমার লেজটি তোমায় দিতে পারি না।

মাছি তখন চিংড়িকে বলল : তোমার লেজটা তাহলে আমায় দাও, চিংড়ি।

চিংড়ি জবাব দিল : তা আমি পারব না। দেখ না, আমার পা-গুলো চলার পক্ষে কি রকম সরু আর দুর্বল, কিন্তু আমার লেজটি চওড়া আর শক্ত। যখন আমি জলের মধ্যে এটা নাড়ি, তখন এ আমায় ঠেলে নিয়ে চলে। নাড়ি-চাড়ি, নাড়ি-চাড়ি-আর যেখানে খুশি সাঁতার কেটে বেড়াই। আমার লেজও দাঁড়ের মতো কাজ করে।

মাছি আরো দূরে উড়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে মাছি একটা হরিণকে তার বাচ্চার সঙ্গে দেখতে পেল। হরিণটির ছোট্ট একটি লেজ ছিল-ক্ষুদে নরম, সাদা, লেজ।

অমনি মাছি ভন ভন করতে আরম্ভ করল : তোমার ছোট্ট লেজটি দাও না হরিণ!

হরিণ ভয় পেয়ে গেল।

হরিণ বললে : কেন ভাই? কেন? যদি তোমায় আমি লেজটি দিই, তাহলে আমি যে আমার বাচ্চাদের হারাব।

অবাক হয়ে মাছি বললে : তোমার লেজ তাদের কি কাজে লাগবে?

হরিণ বললে : বাঃ, কী প্রশ্নই না তুমি করলে। ধর, যখন একটা নেকড়ে আমাদের তাড়া করে–তখন আমি বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে লুকোই আর ছানারা আমার পিছু নেয়। কেবল তারাই আমায় গাছের মধ্যে দেখতে পায়, কেননা আমি আমার ছোট্ট সাদা লেজটা রুমালের মতো নাড়ি, যেন বলি : এই দিকে, বাছারা, এই দিকে। তারা তাদের সামনে সাদা মতো একটা কিছু নড়তে দেখে আমার পিছু নেয়। আর এইভাবেই আমরা নেকড়ের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচি,

নিরুপায় হয়ে মাছি উড়ে গেল।

সে উড়তে লাগল-যতক্ষণ না সে একটা বনের মধ্যে গাছের ডালে একটা কাঠঠোকরাকে দেখতে পেল।

তাকে দেখে মাছি বলল : কাঠঠোকরা, তোমার লেজটা আমায় দাও। এটা তো তোমার শুধু সুন্দর হবার জন্যে!

কাঠঠোকরা বললে : কী মাথা-মোটা তুমি! তাহলে কি করে আমি কাঠ ঠুকরে খাবার পাব? কি করে বাসা তৈরী করব বাচ্চাদের জন্যে?

মাছি বলল : কিন্তু তুমি তো তা তোমার ঠোঁট দিয়েই করতে পার!

কাঠঠোকরা জবাব দিল : ঠোঁট কেবল ঠোঁটই। কিন্তু লেজ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। তুমি দেখ, কিভাবে আমি ঠোকরাই।

কাঠঠোকরা তার শক্ত লেজ দিয়ে গাছের ছাল আঁকড়ে ধরে গা দুলিয়ে এমন ঠোক্কর দিতে লাগল যে তার থেকে ছালের চোকলা উড়তে লাগল।

মাছি এটা না মেনে পারল না যে, কাঠঠোকরা যখন ঠোকরায় তখন সে লেজের ওপর বসে। এটা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। এটা তার ঠেক্‌নার কাজ করে।

মাছি আর কোথাও উড়ে গেল না। মাছি দেখতে পেল সব প্রাণীর লেজই কাজের জন্যে। বে-দরকারী লেজ কোথাও নেই–বনেও না, নদীতেও না। সে মনে মনে ভাবল–বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। "আমি লোকটাকে সোজা করবই। যতক্ষণ না সে আমায় লেজ করে দেয়। আমি তাকে কষ্ট দেব।"

মানুষটি জানলায় বসে বাগান দেখছিল। মাছি তার নাকে এসে বসল। লোকটি নাক ঝাড়া দিল, কিন্তু ততক্ষণে সে তার কপালে গিয়ে ব'সে পড়েছে। লোকটি কপাল নাড়ল-মাছি তখন আবার তার নাকে?

লোকটি কাতর প্রার্থনা জানাল : আমায় ছেড়ে দাও, মাছি।

ভন ভন করে মাছি বলল : কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না। কেন তুমি আমায় অকেজো লেজ আছে কি না দেখতে পাঠিয়ে বোকা বানিয়েছে। আমি সব প্রাণীকেই জিগ্‌গেস করেছি—তাদের সবার লেজই দরকারী।

লোকটি দেখল মাছি ছাড়বার পাত্র নয়—এমনই বদ এটা। একটু ভেবে সে বলল; মাছি, মাছি। দেখ, মাঠে গরু রয়েছে। তাকে জিগগেস করো তার লেজের কী দরকার।

মাছি জানলা দিয়ে উড়ে গিয়ে গরুর পিঠে বসে ভন ভন করে জিগগেস করল : গরু, গরু। তোমার লেজ কিসের জন্যে? তোমার লেজ কিসের জন্যে?

গরু একটি কথাও বলল না-একটি কথাও না। তারপর হঠাৎ সে তার লেজ দিয়ে নিজের পিঠে সপাৎ করে মারল—আর মাছি ছিটকে পড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে মাছির শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলা-পা দুটো উচু হয়ে রইল। আকাশের দিকে।

লোকটি জানলা থেকে বলল : এ-ই ঠিক করেছে মাছির। মানুষকে কষ্ট দিও না, প্রাণীদেরও কষ্ট দিও না। তুমি আমাদের কেবল জ্বালিয়ে মেরেছি।

[সোভিয়েট শিশুসাহিত্যিক ভি. বিয়াঙ্কির “টেইল্‌স্‌” গল্পের অনুবাদ।]

www.bengaliebook.com

ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা

একটি লোকের একটা ষাঁড়, একটা গাধা আর একটা ছাগল ছিল। লোকটি বেজায় অত্যাচার করত তাদের ওপর। ষাঁড়কে দিয়ে ঘানি টানোত, গাধা দিয়ে মাল বওয়াত আর ছাগলের সবটুকু দুধ দুয়ে নিয়ে বাচ্চাদের কেটে কেটে খেত, কিন্তু তাদের কিছুই প্রায় খেতে দিত না। কথায় কথায় বেদম প্রহার দিত।

তিনজনেই সব সময় বাধা থাকত, কেবল রাত্তির বেলায় ছাগলছানাদের শেয়ালে নিয়ে যাবে ব'লে গোয়ালঘরের মাচায় ছাগলকে না বেঁধেই ছানাদের সঙ্গে রাখা হত।

একদিন দিনের বেলায় কি ক'রে যেন ষাঁড়, গাধা, ছাগল তিনজনেই ছাড়া অবস্থায় ছিল। লোকটিও কি কাজে বাইরে গিয়ে ফিরতে দেরি ক'রে ফেলল। তিনজনের অনেক দিনের চাড়া দিয়ে উঠতেই গাধা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ভাল ভাল জি খেতে আরম্ভ করল। ষাঁড়টা কিছুক্ষণের মধ্যেই সাফ করে ফেলল লোকটির চমৎকার তরকারির বাগানটা। ছাগলটা আর কী করে, কিছুই যখন খাবার নেই, তখন সে বারান্দায় মেলা একটা আস্ত কাপড় খেয়ে ফেলল মনের আনন্দে।

লোকটি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে তাজব ব'নে গেল। তারপর চেলাকাঠ দিয়ে এমন মার মারল তিনজনকে যে আশপাশের পাঁচটা গ্রাম জেনে গেল লোকটির বাড়ি কিছু হয়েছে। সেদিনকার মতো তিনজনেরই খাওয়া বন্ধ করে দিল লোকটি।

রাত হতেই মাচা থেকে টুক ক'রে লাফিয়ে পড়ল ছাগল। তারপর গাধা আর ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল : গাধা ভাই, ষাঁড় ভাই, জেগে আছ।

দুজনেই বলল : হ্যাঁ, ভাই!

ছাগল বলল : কি করা যায়?

ওরা বলল : কী আর করব, গলা যে বাঁধা।

ছাগল বলল সে জন্যে ভাবনা নেই, আমি কি-না খাই? আমি এখুনি তোমাদের গলার দড়ি দুটো খেয়ে ফেলছি। আর খিদেও যা পেয়েছে।

ছাগল দড়ি দুটো খেয়ে ফেলতেই তিনজনের পরামর্শ-সভা। শুরু হয়ে গেল।

তারা পরামর্শ করে একটা 'সমিতি' তৈরী করল। ঠিক হল আবার যদি এই রকম হয়, তাহলে তিনজনেই একসঙ্গে লোকটিকে আক্রমণ করবে। ষাঁড় আর গাধা দুজনে একমত হয়ে ছাগলকে সমিতির সম্পাদক করল। কিন্তু গোল বাধল সভাপতি হওয়া নিয়ে। ষাঁড় আর গাধা দুজনেই সভাপতি হতে চায়। বেজায় ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। শেষকালে তারা কে বেশী যোগ্য ঠিক করবার জন্যে, সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেল। ছাগলকে রেখে গেল লোকটির ওপর নজর রাখতে। মোড়ল ছিল লোকটির বন্ধু। গাধাটা চেঁচামেচি করে ঘুম ভাঙাতেই বাইরে বেরিয়ে মোড়ল চিনল এই দুটি তার বন্ধুর ষাঁড় আর গাধা। সে সব কথা শুনে বলল : বেশ, তোমরা এখন আমার বাইরের ঘরে খাও আর বিশ্রাম কর, পরে তোমাদের বলছি কে যোগ্য বেশী। ব'লে সে তার গোয়ালঘর দেখিয়ে দিল। দুজনেরই খুব খিদে। তারা গোয়ালঘরে ঢুকতেই মোড়ল গোয়ালের শিকল তুলে দিয়ে বলল : মানুষের বিরুদ্ধে সমিতি গড়ার মজাটা কি, কাল সকালে তোমাদের মনিবের হাতে টের পাবে।

এদিকে অনেক রাত হয়ে যেতেই ছাগল বুঝল ওরা বিপদে পড়েছে, তাই আসতে দেরি হচ্ছে। সে তার ছানাদের নিয়ে প্রাণের ভয়ে ধীরে ধীরে লোকটির বাড়ি ছেড়ে চলে গেল বনের দিকে।

সকাল হতেই খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল চারিদিকে। লোকটি এক সময়ে খবর পেল ষাঁড় আর গাধা আছে তার মোড়ল-বন্ধুর বাড়ি। আমনি দড়ি আর লাঠি নিয়ে ছুটল সে মোড়লের কাছে, জানোয়ার আনতে।

www.bengaliebook.com

‘মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই’ এই কথা ভাবতে ভাবতে খালি পেটে ষাঁড় আর গাধা পালাবার মতলব আঁটছিল। এমন সময় সেখানে লোকটি হাজির হল। তারপর লোকটির হাতে প্রচণ্ড মার খেতে খেতে ফিরে এসে গাধা আর ষাঁড় আবার মাল বইতে আর ঘানি টানতে শুরু করল আগের মতোই। কেবল ছাগলটাই আর কখনো ফিরে এল না। কারণ অনেক মহাপুরুষের মতো ছাগলটারও একটু দাড়ি ছিল।

উপদেশ : নিজের কাজের মীমাংসা করতে অন্যের কাছে কখনো যেতে নেই।

হরতাল

রেলে ‘হরতাল’ ‘হরতাল’ একটা রব উঠেছে। সে খবর ইঞ্জিন, লাইন, ঘণ্টা, সিগন্যাল এদের কাছেও পৌঁছে গেছে। তাই এরা একটা সভা ডাকল। মস্ত সভা। পূর্ণিমার দিন রাত দুটোয় অস্পষ্ট মেঘে ঢাকা চাদের আলোর নীচে সবাই জড়ো হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিশালবপু সভাপতি ইঞ্জিন মশাই এলেন। র্তার লেট হয়ে গেছে। লম্বা চেহারার সিগন্যাল সাহেব এলেন হাত দুটো লাটুপটু করতে করতে, তিনি কখনো নীল চোখে, কখনো লাল চোখে তাকান। বন্দুক উচোনো সিপাইদের মতো সারি বেঁধে এলেন লাইন-ক্লিয়ার করা যন্ত্রের হাতলেরা। ঠকাঠক ঠকাঠক করতে করতে রোগা রোগ লাইন আর টেলিগেরাফের খুঁটির মিছিল করে সভা ভরিয়ে দিল। ফাজলামি করতে করতে ইস্‌টিশানের ঘণ্টা আর গার্ড সাহেবের লাল-সবুজ নিশানেরাও হাজির। সভা জমজমাট। সভাপতি শুরু করলেন :

“ভাইসব, তোমরা শুনেছ মানুষ-মজুরের হরতাল করছে। কিন্তু মানুষ-মজুরেরা কি জানে যে তাদের চেয়েও বেশী কষ্ট করতে হয় আমাদের, এইসব ইঞ্জিন-লাইন-সিগন্যাল-ঘণ্টাদের? জানলে তারা আমাদের দাবিগুলিও কর্তাদের জানাতে ভুলত না। বন্ধুগণ, তোমরা জানো আমার এই বিরাট গতরটার জন্যে আমি একটু বেশী খাই, কিন্তু যুদ্ধের আগে যতটা কয়লা খেতে পেতুম এখন আর ততটা পাই না, অনেক কম পাই। অথচ অনেক বেশী মানুষ আর মাল আমাদের টানতে হচ্ছে যুদ্ধের পর থেকে। তাই বন্ধুগণ, আমরা এই ধর্মঘটে সাহায্য করব। আর কিছু না হোক, বছরের পর বছর একটানা খাটুনির হাত থেকে কয়েক দিনের জন্যে আমরা রেহাই পাব। সেইটাই আমাদের লাভ হবে। তাতে শরীর একটু ভাল হতে পারে।

প্রস্তাব সমর্থন করে ইঞ্জিনের চাকার বলল : ধর্মঘট হলে আমরা এক-পাও নড়ছি না, দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকব সকলে।

সিগন্যাল সাহেব বলল : মানুষ-মজুর আর আমাদের বড়বাবু ইঞ্জিন মশাইরা তবু কিছু খেতে পান। আমরা কিছুই পাই না, আমরা খাঁটি মজুর।

হরতাল হলে আমি আর রাস্তার পুলিশের মতো হাত ওঠান-নামান মানবো না; চোখ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে পড়ে থাকব।

লাইন ক্লিয়ার করা যন্ত্রের হাতল বলল : আমরাও হরতাল করব। হরতালের সময় হাজার ঠেলাঠেলিতেও আমরা নড়ছি না। দেখি কি করে লাইন ক্লিয়ার হয়।

লাইনেরা বলল : ঠিক ঠিক, আমরাও নট নড়ন-চড়ন, দাদা।

ইস্‌টিশানের ঘণ্টা বলল : সে সময় আমায় খুঁজেই পাবে না কেউ। ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াব। লাল-সবুজ নিশান বন্ধুরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ট্রেন ছাড়বে কি করে?

সভাপতি ইঞ্জিন মশাই বললেন : আমাকে বড়বাবু ইঞ্জিন মশাই বলে আর সম্মান করতে হবে না। আমি তোমাদের, বিশেষ করে আমার অধীনস্থ কর্মচারী চাকাদের কথা শুনে এতই উৎসাহিত হয়েছি যে আমি ঠিক করেছি। অনশন ধর্মঘট করব। এক টুকরো কয়লাও আমি খাব না, তাহলেই সব আচল হয়ে পড়বে।

এদিকে কতকগুলো ইস্‌টিশানের ঘড়ি আর বাঁশি এসেছিল কর্তাদের দালাল হয়ে সভা ভাঙবার জন্যে। সভার কাজ ঠিক মতো হচ্ছে দেখে বাঁশিগুলো টিক টিক করে টিটুকিরী মেরে হট্টগোল করতে লাগল। আমনি সবাই হৈ হৈ করে তেড়ে মেড়ে মারতে গেল ঘড়ি আর বাঁশিদের। ঘড়িরা আর কী করে, প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি ছ’টা বাজিয়ে দিল। আমনি সূর্য উঠে পড়ল। দিন হতেই সকলে ছুটে চলে গেল যে যার জায়গায়। সভা আর সেদিন হল না।

www.bengaliebook.com